যোগ্যতা

মৃগাঙ্কী একটা বিশাল হলের প্রথম সারির চেয়ারে বসে আছে, একটা লোক এসে ওকে চা বিস্কুট দিলো, অভ্যর্থনা জানালো। চায় চুমুক দিতে দিতে সে পঁচিশ বছর পিছনে ফেলে আসা একটা দিনের কথা মনে করলো।

সেই দিনও একটা বিশাল হলে দাঁড়িয়ে ছিলো মৃগাঙ্কী। ছোটো বেলা থেকেই পরিবার নানা আর্থিক সমস্যার ভেতর দিয়ে গিয়েছিল। ভীষন কষ্টে স্কুলের মাইনে দিত ওর মা। কোনো কোনো দিন দুপুরের ভাত জুটতো না কিন্তু তবুও মা ওকে স্কুল ছাড়তে বলে নি। মৃগাঙ্কীর বাবা, মেয়েকে শুধু প্রথম কয়েকটা মাস দেখতে পেরেছিল তারপর এক দিন খবর আসে রাস্তায় দুর্ঘটনার কারণে প্রাণ হারাতে হয়েছে তাকে। তখন সব প্রতিবেশীরা মৃগাঙ্কীর মা-কে এসে বলেছিলো, “ছেলে হলে এক কথা হতো কিন্তু মেয়ে তো, দেখ কি করবি।”

এই কথা শুনে বড় হওয়ার পর কষ্ট করে পড়াশোনা শেষ করে মৃগাঙ্কী। তারপর বড় কলেজ থেকে পাশ করে বড় চাকরি পায় মুম্বাইতে। সেই দিন তাকে অফিসের সর্বোচ্চ স্থানে পদোন্নতি করার কথা ছিল। সে স্টেজের ওপরে দাঁড়িয়ে তার পুরস্কার নেওয়ার সময় সর্ব প্রথম সারিতে মা-কে দেখে। মায়ের চোখে জল ছিলো সে দিন। মনে পড়ে যাচ্ছিল সেই লোকেদের কথা যারা বলতো মেয়ে কিছু পারবে না, সেই দিনের কথা যে দিন খালি পেটে শুতে হতো, সেই দিনের কথা যেই দিন গুলো মা - কে বাবার জন্মদিন এ অশ্রুজলে ভেসে যেতে দেখেছিল। সে দিন মৃগাঙ্কীর মনে হলো সেই সব কিছু কে পিছনে রেখে নতুন জীবন শুরু করার সুযোগ পাচ্ছে সে। মা-কে ডাকা হয়েছিল স্টেজের ওপর কিছু বলার জন্যে। চোখে জল নিয়ে বেশি কিছু বলতে পারে নি মা। শুধু বলেছিল, “তোর বাবা থাকলে আজ ভীষন খুশি হতেন। সবাই কে যোগ্য জবাব দিয়েছিস মা। আজ আমি গর্ব করে বলতে পারি আমার মেয়ে-ই আমার ছেলের সমান। “

সেই মুহূর্তে হাঁসি টা বিলীন হয়ে গেলো মৃগাঙ্কীর। সেই কঠিন সময়ের সংগ্রাম , আত্মীয়দের নিন্দা পেরিয়ে এসে আজকের জয়টা আর জয় মনে হলো না। মনে হলো পৃথিবীর কাছে জিতলেও আজ সে হেরে গেছে। তার মায়ের স্টেজে উঠে বলা শেষ লাইনটি তার কানে বাজতে লাগলো। সত্যি কি এই সমাজে মেয়েরা সফল তখনই হতে পারে যখন সে ছেলের সমান হয়ে? নারীরা কি নারী হয়ে সাফল্যের যোগ্য হতে পারে না? তখন মাকে কিছু বলতে পারে নি মৃগাঙ্কী।

কিন্তু আজ সেও এক হলে বসে আছে আর স্টেজের ওপর তার মেয়ে, মৃন্ময়ী পুরস্কার নিতে উঠছে। মৃগাঙ্কীর চোখে জল। তাকেও স্টেজে ডাকা হলো আজ কিছু বলার জন্যে। সে স্টেজে উঠল, মাইক হাতে ধরে গর্বের সাথে বললো, “আমার মেয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে, সমাজকে যে নারীরা চাইলে সব পারে। আমি গর্বিত কারণ আমি এক প্রকৃত নারীর মা। ”

-জয়স্মিতা বোস

IX-A

স্বপ্নের ডানা

আজকাল মিনির এক নতুন আবদার জুটেছে – ওকে একটা টিয়াপাখি কিনে দিতেই হবে।

" একটা পাখি রাখলে কী হবে মা? আমি প্রমিজ করছি, ওর দেখভালের সমস্ত দায়িত্ব আমার।"

" যত বয়স বাড়ছে তত যেন দিন দিন পাকা হয়ে যাচ্ছিস। তুই কত খেয়াল রাখবি আমি জানি। নিজের খেয়াল রাখতে পারো না, আবার টিয়াপাখি পুষবে।"

বকুনি খাওয়ার পর মিনি মুখ গোমড়া করে বারান্দায় গিয়ে বসলো। মন খারাপ দেখে পার্বতী তার কাছে মুহূর্তের মধ্যে ছুটে এলো। পার্বতী মিনিদের বাড়ির ঠিকে কাজেরমাসী, মিনতির মেয়ে। গরমের ছুটিতে যখন বন্ধুদের সঙ্গে এক মাস দেখা করতে পারে না, তখন পার্বতীর সঙ্গেই মিনির যত খেলা, খুনসুটি। মাঝে মাঝে মনে হয় পার্বতীর চেয়ে ভালো তাকে আর কেউ চেনে না।

মিনি ক্লাস সেভেনে পড়ে। পার্বতী মিনির প্রায় সমবয়সী। সেও একটা বাংলা মিডিয়াম স্কুলে পড়ে। ওদের অভাবের সংসার, অকালে বাবা মারা গেছে। অতএব মিনতিকে ঠিকে কাজেরলোক হিসেবে কাজ করতে হয়। মাঝে মাঝে পার্বতীও হাত মেলায়।

অবশেষে মিনির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল। ওর বাবা মা অনেক আলোচনা করে ঠিক করলেন, একটা ছোট টিয়াপাখি পুষে নেওয়াই যায়। মিনির আনন্দের বাধ রইলো না। এখন ওর প্রায় সমস্ত সময় কাটতো টিয়ার সঙ্গে খেলা করতে, ওকে বুলি শেখাতে। পার্বতীকেও এই খেলা থেকে বাদ রাখতো না। তবে এই খুশি ক্ষণস্থায়ী ছিল। একদিন টিয়াপাখি কে খাবার দেওয়ার পর মিনি খাঁচাটা ঠিক করে বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে পাখিটার কোনো চিহ্নমাত্র নেই।

পাখিটা হারিয়ে ফেলে মিনি দুঃখে কাতর হয়ে পড়ল। তার মা সান্তনা দেওয়ার জন্য বারবার বলতেন, "একটি অবাধ মনকে কি কেউ কখনও চেপে রাখতে পারে?" তবে মিনির মনে সেটা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতো লাগত।

যাই হোক, সময় যেমন সমস্ত কষ্ট ধীরে ধীরে মুছে দেয়, তেমনি মিনিও আস্তে আস্তে পাখির কথা ভুলে গেলো। সে একটু বড় হওয়ায় তার মন পরিণত হলো। তবে পার্বতীর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব সে এখনো ভোলেনি। হঠাৎ একদিন সে লক্ষ্য করলো, পার্বতীর মন ভালো নেই। কৌতূহলবশত সে জিজ্ঞাসা করে বসলো, "কিরে, তোকে এত উদাসীন লাগছে কেনো?"

"কী বলব বল, তুই তো জানিস মায়ের কাছে মাসে হাতখরচ খুবই কম বাঁচে। তবুও যা থাকতো, তা দিয়ে কষ্টে-সৃষ্টে আমার লেখাপড়া চালাতো। তবে এখন তাও আর সম্ভব হচ্ছে না। তাই মা ঠিক করেছে মায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমিও লোকের বাড়িতে কাজে লেগে পড়ব। কিছু হলেও তো মায়ের সুবিধা হবে। তবে দুঃখ এই যে, আমার ডাক্তার হওয়ার স্বপ্নটা হয়তো স্বপ্নই রয়ে যাবে।"

"তুই এত চিন্তা করছিস কেনো, আমি মায়ের সাথে কথা বলে দেখছি কী করা যায়।"

তবে মায়ের কাছে গিয়েও কোনো সমাধান হলো না। উনি বললেন, “এতে আমার কী করার আছে বল। এটা ওদের ব্যাপার, ওরাই বুঝুক।”

মিনির আর রাগ সইলো না। রাগের মাথায় বলে ফেলল, “ তুমি যে আমার পাখি হারিয়ে যাওয়ার পর বলতে, একটি অবাধ মনকে কেউ ধরে রাখতে পারে না। তবে পার্বতীর বেলা? ওরো তো একটা স্বপ্ন আছে, তার বেলা? ওর স্বপ্নকে কী তুমি বাধা দিচ্ছে না?”

বিকেল গড়িয়ে যাওয়ার পরই মিনির রাগ কমলো। মনে মনে একটু অনুতাপও হচ্ছিল। তবে মিনির মা-ই তার কাছে এলেন এবং বুঝিয়ে বললেন, “তুই ঠিকই বলেছিস, শুধুমাত্র টাকার জন্য পার্বতীর ইচ্ছা আটকে রাখা উচিত নয়। তাই তোর বাবা আর আমি মিলে ঠিক করেছি পার্বতীর স্কুলে একটা মেধা বৃত্তির জন্য আবেদন করব। তারপর যা টাকা লাগবে, তা আমরাই দিয়ে দেবো। দরকার হলে না হয় মিনতিকেও মানিয়ে নেবো।”

মিনি মনে মনে ভাবল, সেই দিন পাখিটা উড়ে যাওয়ায় ওর মনে যা কষ্ট হয়েছিল, তা একটু হলেও লাঘব হয়েছে। পার্বতীর স্বপ্নের পাখিটাও এবার আকাশে উড়তে চলেছে।

-উর্জা ঘোষ

IX-B

ছায়াদেবী

অনেক কাল আগে সবরণপুরি নামে এক দেশ ছিল। গ্রামে প্রত্যেক বছর সোনালি ধান ফলত, যেই কারণে গ্রামের নামকরণ। গ্রামবাসীরা সকলে সুখে-শান্তিতে বাস করত। তারপর দেশে একদিন এক নতুন রাজা সিংহাসন দখল করলেন। সেই রাজা ছিলেন বড় নিষ্ঠুর এবং প্রজাদের থেকে অন্যায় ভাবে খাজনা আদায় করতেন। সারা বছর পরিশ্রম করেও গ্রামবাসীরদের খাজনা মেটানোর জন্য যথেষ্ট টাকা থাকত না।

একদিন রাজার প্রহরীরা বলরাম বলে এক চাষীকে ধরল খাজনা না দিতে পারার জন্য। বলরাম ভয়ে কাতর হয়ে পড়ল। একজন প্রহরী হাতে চাবুক নিয়ে এগিয়ে আসছিল তার দিকে- অন্য কৃষকরা শুধু দেখে গেল, কিছু করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে একটা ছায়া এল। এক মানুষ, সারা শরীর কালোতে ঢাকা। সেই ব্যক্তি বলরামকে রক্ষা করল- প্রত্যেক প্রহরী তার লাঠির সামনে পরাজিত হয়ে গেল। অসহায়, তারা বলরাম কে ছেড়ে দিল। তারপর কী হল তা কারুর ঠিক জানা নেই। সেই ব্যক্তি যেরকম তীব্র গতিতে উপস্থিত হয়েছিল, সেরকম ভাবেই সে গায়েব হয়ে গেল। কিন্তু রাজার প্রহরীরা যখনই কোনো প্রজাকে হয়রান করত, সেই ছায়াময় ব্যক্তি তাদের রক্ষা করত। সময়ের সাথে সাথে, গ্রামবাসীরা তাকে 'ছায়া দেবতা' বলে পুজো করতে লাগল।

একদিন এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। ছায়া দেবতা রাজার কাছে ধরা পড়ে গেল। তার বিচার দেখতে সবাই রাজার দরবারে উপস্থিত হল। রক্ষীরা ছায়া দেবতাকে রাজার সামনে নিয়ে এল। খুলে দিল তার কালো মুখোশ। সকলে যা দেখল, তাতে তারা অবাক হয়ে গেল। দিনের পর দিন ছায়া দেবতার যে ছবি সকলের মনে আঁকা, তার কোনো মিল ছিল না সে ছবির সাথে। রাজার সামনে যিনি দাঁড়িয়েছিল, সে এক নারী। তার চুল বাতাসে উড়ছে, তার চোখে ভয়ের বিন্দু মাত্র চিন্হ নেই। রাজার পাশে রানী বসেছিলেন। অপরাধির মুখ দেখে তিনি কথা বলতে বাধ্য হলেন।

"মহারাজ, ওকে ছেড়ে দিন। ও সামান্য এক মেয়ে, ও আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। দয়া করে ওকে ছেরে দিন।"

আশ্চর্যের ব্যপার, ক্ষমা চাওয়ার বদলে সেই স্ত্রী আরো রেগে গেল। "আমি যা করেছি, সঠিক করেছি, এবং তার জন্য যদি আমার মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হয় তাতে আমি রাজি। কিন্তু নারী হওয়ার জন্য আমার বিচার আলাদা হবে, তা আমি মেনে নিতে পারি না।"

তার কথায় কী মন্ত্র ছিল তা বলা যায় না, কিন্তু তাতে প্রজারা মুগ্ধ হয়ে গেল। এত দিন ধরে যে তাদের সহায়তা করেছে, সে পুরুষ না নারী, তা গুরুত্বপুর্ণ নয়। তাদের রক্ষককে তারা কিছুতেই রাজদণ্ড পেতে দেবে না। ন্যায়ের জন্য লড়াই করছে যে, তাকে তারা হেরে যেতে দেবে না। প্রজারা সবাই প্রতিবাদ করতে লাগল। রাজার সামনে তারা তাদের রক্ষককের মুক্তির দাবি করল। তারা রাজাকে বলল, তার সাজা হলে সকল গ্রামবাসীদেরও যেন সাজা হয়। অবশেষে তাদের তীব্র প্রতিবাদে রাজা সেই নারীকে মুক্ত করে দিলেন, এবং গ্রামবাসীদের খাজনার টাকা কমিয়ে দিলেন।

সেইদিনের পরও কেউ সেই নারীর কোনো খবর পায়না, কিন্তু বিপদের সময় তার আবির্ভাব হত। গ্রামবাসিরা তাকে সম্মানের সঙ্গে "ছায়াদেবী" বলে পুজো করতে লাগল।

-কথাকলি মন্ডল

VII-A

Edited by উর্জা ঘোষ

'আবার হল দেখা - চেরনোবিল'

'ক্রিচ' | বাসটি একটা বিকট শব্দ করে হঠাত থেমে গেল। এভাবে কেউ গাড়ির ব্রেক দেয়? আধ ঘন্টা না ঘন্টাখানেক, ওলগার ঘুমটা ভেঙে গেল। গভীর ঘুম ভাঙলে যা হয়, ওলগা প্রচণ্ড বিরক্তি ভরে বাইরের দিকে তাকালো। পৃথিবীটা যেন বরফের চাদরের মুড়ে গেছে। সূর্যের রশ্মি গুলো বরফের উপর পড়ে যেন আরো তীক্ষ্ণ হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। একটু দূরে প্রকাণ্ড নাগরদোলাটি দেখা যাচ্ছিল। ওলগার মনে পড়ে গেল ছোটবেলার কথা। প্রপিয়াত বেনোদন পার্কের উদ্বোধন হবে বলে ওলগা আর বন্ধুদের মধ্যে উন্মাদনা কম ছিল না। ওলগা তখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। হ্রদনা থেকে তারা সবে চেরনোবিল এ এসে বসবাস শুরু করেছে। ওলগার বাবা মিকোলাই ছিল বংশের প্রথম স্নাতক। তার আগে তাদের পূর্বপুরুষদের চাসবাস করেই দিন গুজরান হত। ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং করার পর বহু মানুষের মত সমৃদ্ধশালী জীবনের আশায় তারা দলে দলে চেরনোবিলে আসে কাজের আশায়। দরকারি যোগ্যতা থাকার দরুন মিকোলাই সহজেই পরমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জেনারেটোর ইঞ্জিনিয়ারের কাজ পেয়ে যায়। বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন সবাইকে ছেড়ে আসার দরুন প্রথম প্রথম

ওলগার মন খারাপ থাকত। তাই অন্য বাচ্চাদের মত প্রপিয়াত বেনোদন পার্ক উদ্বোধন নিয়ে ওলগাও কিছুটা খুশি ছিল। পুরোনো কথা মনে পড়ে যাওয়াতে ওলগার মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। সে কবে কার ক্বথা... বা বলেছিল প্রথম দিন প্রকাণ্ড নাগরদোলায় ওলগাকে চড়াবে। ওলগা বাইরে দেখতে থাকে। হলুদ রঙটা এখনও গাড়ো আছে। শুধু নানা রকম গাছ গাছালি, লতানো উদ্ভিদ জন্মে গেছে গায়ে। জায়গায় জায়গায় মরচেও পড়ে গেছে।

ওলগা বুঝল তারা চেরনোবিল পৌঁছে গেছে।

ওলগা আলগা চুলের গোছা বেধে নিয়ে জ্যাকেটটা পড়ে নিল। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করাতে যা বোঝা গেল তা হল, হঠাত করে বাসের সাথে একটা ঘোড়ার ধাক্কা লাগাতে বাস থামাতে হয়েছে।   পরমানবিক বিপর্যয়ের পর দফায় দফায় চেরনোবিলের তেজস্ক্রিয় বর্জন অঞ্চলে বসবাসকারীদের উচ্ছেদ করে রাশিয়ার নানা জায়গায় পুনর্বাসন দেওয়া হয়। তারপর থেকে এখানে মানুষ থাকেনা বললেই চলে। প্রকৃতি তারপর প্রায় পুরো জায়গাটা পুনরুদ্ধার করে নিয়েছে। যেখানে এক সময় অফিস, কাছারি, স্কুল ছিল, যেখানে মানুষের আনাগোনায় সব কিছু গমগম করত সেখানে আজ আগাছার সমাহার। পুরো জায়গাটা একটা ভূতুরে শহরে পরিনত হয়েছে। চারিদিকে জঙ্গল, প্রাণী বলতে নানাবিধ পশুপাখি ,শেয়াল,উল্লুক, হরীণ, বাইসন, ঈগল। এমনকি একটি প্রায় অবলুপ্ত প্রজাতির ঘোড়া এখানে বংশ বিস্তার করে দিব্যি বসবাস করছে। ঘোড়ার গায়ে যে কতটা জোর থাকে তার সেরকম ধারনা ছিলনা ওলগার। বাস ড্রাইভারের থেকে ওলগা জানতে পারে ঘোরাটি যেমন আহত হয়েছে,তেমন বাসেরও বিশেষ ক্ষতি হয়েছে, ঠিক হতে সময় লাগবে। বাকি পথটা পায় হেটেই যেতে হবে।

আগত্যা ওলগা বাস থেকে নেমে পড়ল। কাধে ব্যাকপ্যাক আর সঙ্গী হল ক্যামেরাম্যান দিমিত্রি।   ওলগার বাবা ক্যান্সারে মারা যাওয়ার পর তার মা, তাতিয়ানা ভীষণ কষ্টে বড় করে তোলে। পড়াশুনোয় ওলগা সবসময় তুখোড়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ে পশুপাখিদের ওপর পারমানবিক বিকিরনের প্রভাব নিয়ে গবেষণা করাই তার কাজ। ওলগা বরাবর মনে করত যে তার বাবার ফুসফুসের ক্যান্সারের কারন চেরনোবিলের দুর্ঘটনা তাই এই কাজেই ছিল ছোটবেলা থেকে তার ধ্যানজ্ঞান। হোমিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে সে আজ গবেষণার কাজে নয়োজিত। সেই উপলক্ষয় চেরনোবিলে আসা। মানুষ তো বিশেষ নেই। পশুপাখিদের ওপর তেজস্ক্রিয় বিকিরনের প্রভাব নিয়ে কাজ করাই উদ্দেশ্য। চেরনোবিল ছেড়ে যাওয়ার পর প্রায় কুড়িটা বছর কেটে গেছে।

দিমিত্রি ছেলেটা ছোকরা হলেও সাহসী এবং বাধ্য তাই সাহসে ভর করে ওলগা নেমে পড়ে। ভয় বলতে একটাই, যদি বন্য কোন পশু আক্রমণ করে। তা মানুষ যেমন ওদের ভয় পায় ওরাও মানুষকে ভয় পায়, দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করলেই হল, বিরক্ত না হলে পশুরা আক্রমণ করে না মানুষকে।

“দিমিত্রি, জ্যাকেট আর গগলসটা পড়ে নাও, আর দেরি করা যাবে না।" চেরনবিলের তেজস্ক্রিয়তা কমে গেলেও সাধারন মানুষের জন্য তা এখনও বিপদজনক। তাই এই ব্যাবস্থা, বিশেষ জ্যাকেট আর গগলস না পড়ে যাওয়াটা বোকামো।

প্রথমেই তারা হাঠতে হাঠতে দূগা রাডার সিস্টেমের সামনে পৌছে গেল। কি বিশাল ও প্রকাণ্ড কাঠামো। দেখে ওলগা খানিকটা আশ্চর্য হল। সেখানে কিছু বাইসন এবং হরিণ দেখা গেল। দিমিত্রি ক্রমাগত ছবি তুলে চলেছে। ওলগা লক্ষ্য করল, পশুগুলো স্বাভাবিকের থেকে বেশী বলশালী হয়ে উঠেছে, গায়ের পশম ও বেশ গভীর, কারো কারো পেটের কাছে,গলার কাছে বা পায়ে বারতি মাংসপিণ্ডের মত বারতি ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার পর ওলগা বুঝতে পারে বেশীর ভাগ পশুর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীন হয়ে এসেছে। অনেকের চোখে ছানিও পড়েছে। কিন্তু চলাফেরায় তারা সাবলীল। হয়ত শ্রবণ শক্তি আরো

জোরাল হয়েছে। প্রকৃতি যেমন নির্মম তেমনই বিচিত্র। বিকিরনের ফলে যেমন তারা দৃষ্টি শক্তি হারিয়েছে, তেমনই বাকি ইন্দ্রিয়গুলো বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ওলগারা এবার পৌছে গেল একটা স্কুলের সামনে। ওলগাকে থমকে যেতে দেখে দিমিত্রি প্রশ্ন করলো, “আমরা এগোব না?”

ওলগা কিছুক্ষণ চুপে করে থাকল। “এই স্কুলে আমি পড়তাম।”, ওলগা বলে ওঠে, তার চোখের কোনটা চিকচিক করে ওঠে। স্কুলের মধ্যে নানা প্রজাতির কুকুর দেখে ওলগা চমকে ওঠে। এরা কোথা থেকে এল? হয়ত পোষা কুকুরদের যখন চেরনোবিলের বসবাসকারীরা ছেড়ে চলে যায়, তারাই নানা যায়গায় থাকতে শুরু করে ও বংশবিস্তার করে।

ওলগাদেরও একটি কুকুর ছিল, নাম ছিল কিজি। ওলগা একটা কুকুরকে কোলে তুলে নিল। “ও বাবা, এটা তো বেশ ভারী।” কিন্তু এতটা ভার হওয়া স্বাভাবিক নয়।” ওলগা কুকুরটিকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকল। ছটফটানি থেকে প্রমান হচ্ছিল কুকুরটা স্বাভাবিকের থেকে বেশী বলশালী। দাঁতগুলো যেন বেশী বড় আর ধারালো। কুকুরটির জিভের মধ্যে লাল-লাল ফোড়া মতন ঘা লক্ষ্য করল ওলগা। “না, পশুপাখিদের মধ্যে বিবর্তনের খবরটা তাহলে সত্যি” ওলগা মনে মনে ভাবল। অনেকগুলো ছবি, লোম আর - নমুনা সংগ্রহ করল তারা। এরপর চার্চ আর রিয়াক্টার নম্বর ৪ হয়ে আর তারা অবশেষে পৌছল মনুমেন্টের সামনে।

ওলগা ঘড়ির দিকে দেখল। ৩টে বাজে।

“চলো দিমিত্রি, এবার ফেরা যাক। নাহলে অন্ধকার হয়ে যাবে। এই বলে আবার বাসের দিকে তারা হাটা দিল। মনের মধ্যে ঘুরতে থাকল শুধু একটা প্রশ্ন, মানুষকে তো তাড়িয়ে দেওয়া হল, পশুপাখিরা তো দিব্যি আছে। হয়ত ক্যান্সার, ছানি, আরো নানা সমস্যা নিয়ে। হয়ত প্রকৃতি তাদের নতুন শক্তি প্রদান করেছে বিকিরনের হাত থেকে রেহাই পেতে। মানুষ কতটাই বা জানে, কতটাই বা বোঝে?

-মৃগাক্ষি মজুমদার

VIII-B

পুতুল

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল পুতুল।

পুতুল এর ন বছর বয়স,সে তার মায়ের চায়ের দোকানে মাকে সাহায্য করে। সাহায্য মানে গ্লাস ধোয়া, বাটি ধোয়া, এই পর্যন্তই। তার বাবা কারখানায় কাজ করে, মায়ই চায়ের দোকান চালায়। পুতুল সকাল থেকে মাকে সাহায্য করে।

পুতুল স্কুলে যায় না, যখন ওর দিদা বেচে ছিল তখন দিদার কাছে অ আ শিখেছিল, তাই ও কিছু কিছু বাংলা পড়তে পারে ও কিছু আক করতে পারে।   দু বছর আগে দিদা মারা যাওয়ার পর থেকে ওই পর্ব শেষ, এখন পুরোপুরি চায়ের দোকানে কাজ। পুতুল শুনেছিল যে ওর দিদা ম্যাট্রিক পাশ ওর মা উচ্চমাধ্যমিক। ওর মা চালায় চায়ের দোকান, ওর দিদাকে ও কখনো কাজ করতে দেখেনি। আর পুতুলের পড়ার অবস্থা তো কহতব্য নয়।

ওদের চায়ের দোকানের উল্টো দিকে একটা বড় খেলার মাঠ, ওখানে বাচ্চারা ব্যাট বল খেলে, দোলনা চড়ে, তাই দেখছিল পুতুল। ওর ইচ্ছে করছিল ওও খেলে, কিন্তু ও জানে যে ভর্তি দোকান, মা যেতে দেবে না। দীর্ঘ শ্বাস ফেলে ও নিজের কাজে মন দেয়।
সেদিন কোন ক্রিকেট খেলা ছিল টিভিতে, চায়ের দোকানে লোক অল্প। চাপ নেই, তাই ও মাকে বলে ওই মাঠে গেলো। মাঠেও সেদিন বাচ্চা কম , পুতুল ওই মাঠের চারপাশে ছোটা আরম্ভ করল। ওকে কেউ দেখছে না, কিন্তু ওর ওতে ভ্রুক্ষেপ নেই। ও নিজের আনন্দেই ছুটছে।

ক পাক ও ছুটেছিল তা ও জানে না , তবে তিন চার পাঁক হবেই। ও হাঁফ নিতে দাঁড়িয়েছে তখন এক স্যুট পরিহিত ভদ্রলোক ও কে এসে জিজ্ঞেস করলেন ‘তুমি কি দৌড়াও কোথাও?’ । পুতুল উত্তর দিল না, একদৌড়ে দোকানে।

পরদিন সকালে ওই ভদ্রলোক ওদের পাড়ার সুমন্ত্র কাকু কে নিয়ে মার কাছে এল। মায়ের সাথে কিছু কথা বলে তারা চলে গেল। মা ওকে ডেকে বলল,” তোর দৌড় দেখে ওদের পছন্দ হয়েছে, কলকাতায় শনিবার একটাপ্রতিযোগিতা আছে, তোকে নিয়ে যেতে বলল। সুমন্ত্র দাও যাবে।” অবাক হল পুতুল। সঙ্গে একটা উত্তেজনা। প্রতিযোগিতায় যাবে, ও? কিন্তু ও ভেবে দেখল যে শনিবার মার দোকানে ভিড় বেশী থাকে, মা কি আর নিয়ে যেতে পারবে? ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গেল পুতুলের।

কিন্তু শনিবার মা দোকান খুলল না, বরং মা আর সুমন্ত্র কাকুর সাথে পুতুল কলকাতা যাবার ট্রেনে চেপে বসল। শিয়ালদহ নেমে সুমন্ত্র কাকু বাসে করে ওদের নিয়ে গেলো এক মাঠের কাছে, যেখানে পুতুল দেখল অনেক ওর বয়সী বাচ্চারা হাজির হয়েছে। সুমন্ত্র কাকু ওদের রেখে কোথায় চলে গেলো, কিছুক্ষন পরে এসে পুতুলকে বললেন ‘তোর নাম আমি ৫০০০ মিটার এর জন্য দিয়েছি, নাম ডাকলে চলে যাবি, হুইসল বাজলে দৌড়বি আর দেখবি তোকে যেন কেউ হারাতে না পারে।’

তাই হল। নাম ডাকলে পুতুল নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো, হুইসল বাজলে দৌড়লও এবং নিশ্চিত করল যে কেউ ওর থেকে আগে যেতে না পারে। দৌড়ের শেষে যখন ঘোষণা হল ‘বিজয়ী পুতুল কর্মকার’ তখন ওর যে কি আনন্দ বলার নয়।
পুরস্কার হিসেবে ও পেয়েছিল নগদ হাজার টাকা ও একটা মানপত্র। টিফিনও পেয়েছিল , সেটি ও আর ওর মা ভাগাভাগি করে খেয়েছিল।
এ সব দশ বছর আগের কথা। এখন পুতুল কর্মকারকে সবাই চেনে, দেশে বিদেশে অনেক পুরস্কার জিতেছে। ওর এখন অল্প বয়স, বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যে আরেকটু পরিণত হলে ও হয়ত অলিম্পিক্সেও পদক জিততে পারে। ওর মা এখন দকান চালায় না, বাবা কারখানার কাজ ছেড়ে দিয়েছে। বাবাকে একটা বাইক কিনে দিয়েছে, ওটা চেপে তিনি এদিক ওদিক যান। দোতলা বাড়ি হয়েছে, সবই পুতুলের জন্যে।
পুতুল মাঝে মাঝে চিমটি কেটে দেখে, এ সব সত্যি তো?

-মেধা চৌধুরী

9 B

ছদ্মবেশ

ঘটনাটা ঘটলো একটি শান্ত শীতের সকালে | মাস্টারমশাই সব ছাত্রদের বাইরে ডেকেছিলেন এক্কা দোক্কা খেলতে।ছাত্রদের আনন্দের কোনো সীমা ছিল না।কেবল একটি পড়ুয়ার মুখে একটি দ্বিধাগ্রস্থ অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো।এরপর যা কান্ড ঘটল সেটির মতো দুঃসাহসের প্রদর্শন বঙ্গের সেই নিস্তব্দ গ্রামীন অঞ্চলের মানুষ আর কখনো দেখেনি।

পলাশদীঘির নিস্তব্দ পরিবেশে সেরম করে রোমাঞ্চকর কিছুই ঘটতনা।গ্রামের প্রতিটি যুবক যেত তারানাথ পন্ডিতের পাঠশালায় তাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে।তিনি কিশোরদের গণিত,ইতিহাস,ভূগোল ও সাহিত্যের মতো নানা ক্ষেত্রে দক্ষতা লাভ করতে সাহায্য করতেন।তার তত্ত্বাবধানে, রবীন্দ্রনাথের রচনাবলি থেকে শাকেস্পেয়ারের সনেট, দেশ বিদেশের নানা রকম গ্রন্থের থেকে শিক্ষালাভ করত পড়ুয়ারা।তবে তিনি খুব একটা কড়া ছিলেন না। ডানপিটে ছাত্ররা এর পূর্ণ ব্যবহার করে তাকে নিয়ে নানা রকম কৌতুক করত। কেউ কেউ তার মজার ব্যঙ্গচিত্র আঁকত, কেউ কেউ তাকে নকল সাপ দিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা করত, আবার কেউ কেউ ভূতের সাজে রাতে তাকে ভয় দেখানোর পরিকল্পনা করত।এইসব কীর্তিতে সেরম করে শামিল দিতনা শুধুমাত্র একজন ব্যাক্তি।

উমেশের নামটুকু ছাড়া বোধে হয়ে তার সহপাঠীরা আর কিছুই জানতনা তার ব্যাপারে।তার লাজুক স্বভাব তার সম্বন্ধে যতটুকু সম্ভব অপ্রকাশিত রেখেছিল।বাকি ছেলেরা যখন বিরতির সময় খেলাধুলোয় রপ্ত হত,সেই প্রায় সময়েই গাছের তলায় বসে বই পড়ত।পাঠের সময়ে সামান্যতম কথাবার্তা বলত আর অনুশীলনীর সময়ে কোনো সংযোগই করতনা।এই ধরনের প্রকৃতির পিছনে কারণ নির্ধারণ করা যায়নি এবং তার উপস্থিতি অদৃশ্য হয়ে উঠল , সর্বদা থাকত কিন্তু কখনই অনুভব করা যেত না।

একদিন, মাস্টারমশাই ছাত্রদের কাছে একটি অপ্রত্যাশিত খবর নিয়ে আসলেন। কলকাতা থেকে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচিতি পলাশদীঘিতে আসছিল।তিনি তাদের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রকে বেছে নিতেন কলকাতায় একটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য।এটি ছিল ছাত্রদের জন্য একটি বিশাল সুযোগ। কলকাতা এমন একটি জায়গা যার কথা তারা কেবল তাদের বইয়ে পড়েছিল। সেখানে যেতে পারার সৌভাগ্য অনেকের জন্যই অভাবনীয় ছিল।

শিক্ষার্থীদের উত্তেজনা ছিল নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সেই দিনের আগমনের জন্য তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করল।সবথেকে দুষ্ট ছাত্ররাও এখন তাদের বইয়ের পাতার দিকে চেয়ে দেখছিলো ও মনোযোগ সহকারে পাঠ শুনছিলো।এরকম একটি সুযোগ হাতছাড়া করার মতো ভুল এই কিশোররা একেবারেই করতে রাজি ছিলনা।

অবশেষে যখন দিনটি এল, প্রত্যেক শিক্ষার্থী সময়মতো উপস্থিত হল। এটা স্পষ্ট যে তারা প্রত্যেকেই বিষয়টিকে বেশ গুরুত্বের সাথে নিয়েছিল।ভদ্রলোক একটি ঘোড়ার গাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। তার পুরানো বন্ধুকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তিনি ছাত্রদের দিকে ফিরলেন।কোট প্যান্ট পড়া , হাতে সুটকেস্ ধরা সেই মানুষটিকে দেখলে আর বলে দিতে হতনা যে সে খুবই বিশিষ্ট একজন ব্যক্তি ছিলেন।আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর তিনি তার নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করলেন।

তিনি যে প্রথম কয়েকটি প্রশ্ন করলেন তার উত্তর সব শিক্ষার্থীই দিতে পারল।

ভ্রুকুটি করে তিনি মন্তব্য করলেন, "এটি কঠিন সিদ্ধান্ত হতে চলেছে।"

এরপর এলো আসল ধকল।ভদ্রলোক এমন একটি অংক লিখলেন কাগজে যা দেখে ছাত্রদের মুখে বিভ্রান্তি দাবানলের মত ছড়িয়ে গেল।আতঙ্কগ্রস্ত ছাত্ররা যখন মরিয়া হয়ে সমাধানে পৌঁছানোর চেষ্টা করছিল, তখন পিছন থেকে একটা ছোট্ট কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

" উত্তরটাকি , শূন্য?"

" একদম সঠিক!"

সঙ্গে সঙ্গে উমেশের মুখে কয়েক ডজন বিস্মিত চেহারা চেয়ে দেখল।এটা বলা নিরাপদ যে কেউ তার উত্তর আশা করেনি।

পরিবেশ শান্ত হওয়ার পর,ভদ্রলোক বললেন,"এবার আসি শেষ প্রশ্নয়। বলত , তোমাদের মতে আমাদের এই স্বাধীন ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় আদর্শ কি হওয়া উচিত?"

উত্তরের আধিক্য ছড়িয়ে পড়ল।কেউ বলল আর্থিক সম্পদ লাভ করা, কেউ বলল আধুনিকতা, কেউ বলল শিল্প-উন্নয়ন আবার কেউ বলল যান্ত্রিক উন্নতি।

শেষে আবার সেই ক্ষুদ্র কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, বলল,"সাম্য"।

"সত্যিই তো ,সাম্য না এলে বাকি সব উন্নতি কিকরে আসবে!", বললেন ভদ্রলোক।

"তাহলে বোধে হয়ে তোমরা ইতিমধ্যে অনুমান করতে পেরেই গেছ যে আমি কাকে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্তে এসেছি।"

বিস্ময় ও হতাশার কোলাহল শুরু হয়ে গেলো বাকি ছাত্রদের মধ্যে।উমেশের এই প্রতিভা তারা কেউই আশা করেনি।

উচ্চস্বরে তারানাথ পন্ডিত বললেন ,"উমেশ কে আমার তরফ থেকে অনেক শুভেচ্ছা! বাকিরা হতাশ হয় না। এখনও তো তোমাদের পুরো জীবন বাকি !এস, আমরা একটু এক্কা দোক্কা খেলি।"

এরপরই ঘটল আসল কান্ড।ঈর্ষা ও ক্রোধের মধ্যে, কিছু ছাত্র উমেশকে উত্যক্ত করার সিদ্ধান্ত নিল। সে এক পা এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে একটি ছেলে তাকে ধাক্কা দিল।সে মুখ থুবড়ে পড়ল ও অবিশ্বাস্যকর এক দৃশ্য উন্মোচন হল।

ছোট চুলের পরচুলা ও নকল গোফ পড়ে গিয়ে প্রকাশ্যে এল এক কিশোরী।লম্বা চুল , প্রচন্ড রকমের আতংকিত চেহারা, সে যেন প্রায় কাপতেই শুরু করল।

কোলকাতার ভদ্রলোক ছুটে এলেন।মুখে মর্মস্পর্শী অভিব্যক্তি নিয়ে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "এমন উজ্জ্বল ছাত্রী!এরকম ছদ্মবেশ তোমায় ধারণ করতে হলো কেন?"

"বেপরদা উর্মিলা তখন নড়বড়ে গলায় তার দুটি ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল," কিন্তু ওরা যে বলে, মেয়েদের স্থান কেবল অন্তর্মহলেই।"

সবাই নিস্তব্দ রইল।

উর্মিলার মনে পড়ে গেল তার মায়ের কথা।মনে পড়ে গেল সেই দিনের কথা যেদিন সে শুনতে পেয়েছিল তার পিতাকে তার মায়ের চেয়ে তার নবজাতক ভাইয়ের প্রাণকে বেছে নিতে।মনে পড়ল তার দীদার কথা, যাকে সে দেখেছিল তার সুন্দর চুল কেটে ফেলতে ও বর্জনের জীবনযাপন করতে বিধবা হওয়ার পর।মনে পড়ল সেই দিন যেদিন সে নিজের চোখের সামনে দেখেছিল তার মাসিকে সতীদাহ করতে।

সে ভাবল ,আসল ছদ্মবেশী কি সে নিজে?নাকি সত্যিকারের ছদ্মবেশে ছিল তার আশেপাশের পুরুষরা, যারা তাদের অহংকার ও শৌখিনতায় নিমজ্জিত হয়ে নারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের ভান করত?

কি হাস্যকর ব্যাপার, যে এক স্বাধীন জীবনের জন্য তাকে ধারণ করতে হয়েছিল সেই ছদ্মবেশীদেরই ছদ্মবেশ।

-আরশি রায় বিষ্ণু

IX-A

কাঁচের দেওয়াল

আমার সেই সব স্বপ্নগুলি,
আছে কাঁচের দেওয়ালে বন্দি,
মেয়ে বলে তাই কাটা পড়েছে আমার
সোনার ডানাগুলি,
ক্রূর সমাজের এ এক বড়ই জটিল ফন্দি।
ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত আমি, হায়,
লড়বো, পড়বো, উঠবো কিন্তু থামবো না কো মোটে,
এ পৃথিবীও দেখুক এক নারীর জেদ তাকে কোথায় নিয়ে যায়,
এই কাঁচের দেওয়াল ভাঙব আমি,
সেই স্বপ্নের তারায় ভরা আকাশ একদিন ছোঁবো আমি।
হে সমাজ রূপী অসুর তৈরি আমরা,
লড়বো আমরা,
গড়ব আমরা
নিজেদের সিংহাসন।

-অস্মিতা বোস

IX-C

বিদ্রোহিনী

অন্ধকারে জমে যখন ক্লান্তি,

আকাশ ফাটিয়ে ওঠে চিৎকার।

বিদ্রোহের জ্বালা, আলোর স্বপ্ন,

মহাকালের হাসি, নতুন যুগের সন্ধান।

মহাভারতের পাতায় পাতায়,

লুকিয়ে রয়েছে বিদ্রোহের স্বাদ।

দ্রৌপদীর কণ্ঠ, অর্জুনের বাণ,

সব মিলে গড়ে নতুন অভ্যুত্থান ।

ফিনিক্সের মতো উঠে দাঁড়াই,

খাকের মধ্যে থেকে নতুন জীবন পাই।

আত্মার গভীরে জাগে আলোর স্বর,

বিদ্রোহের জ্বালায় পুড়ে শুদ্ধ হয় মন।

পাঞ্চালী তুমি, দীপ্তিময়ী জীবন,

পাশার খেলায় বন্দী, অপমান সহ্য করি,

কুরুসভায় দাঁড়িয়েছ একাকী।

পাঁচ স্বামীর অধীনে, নারী হয়ে জন্মে,

অন্যায়ের বিরুদ্ধে জাগিয়েছ মহাযুদ্ধের অনুরণন।

স্বয়ম্বরে পতি চয়ন , স্বাধীনতা ছিল তোমার ,

কিন্তু ভাগ্যের লেখায় বন্দী হলে কারার।

কুন্তির বাণী, সমাজের বোঝা,

জীবন ছিল যেন এক অবিরাম যোদ্ধা।

পণ রূপে জীবন, অপমানের ছায়া,

তবুও দাঁড়িয়েছ, অবিচল সদায়।

অন্তহীন শাড়ি, অহঙ্কারের পতন,

রাজসভাতে দাঁড়িয়ে ছিলে তুমি, সাহসী ও দৃঢ়,

কণ্ঠে শক্তি, মনে আত্মবিশ্বাস।

প্রতিবাদী মন, অন্ধকারে জ্বলেছে বেলা।

মমতার অগ্নি জ্বালিয়েছ হৃদয়ে,

পুত্রদের হারিয়েও করিয়াছ তুমি ক্ষমা ।

দিয়েছ সতীত্বের নতুন সংজ্ঞা ,

জাগিয়েছ চেতনা , দেখিয়েছ মুক্তির পথ ।

মহাভারতের পাতায়, তুমি সেই অগ্নিজাতা রানী,

চিরকাল জ্বলবে, স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে।

- নন্দিনী শীল

IX-A

পারবে না

এক যে ছিল ছোট্ট মেয়ে

ভাগলপুরে বিনি বলে তারে ডাকে

বাবা ছিলেন গুরুমশাই তার

দিলেন হাতে কলম ধরিয়ে।

লিখতে শিখল স্লেটে অ-আ, ক-খ
পড়তে শিখল তাকের বইগুলি
দাদার সাথে হল পাকা কথা
মেয়ে বললে,"কলিকাতা চলি"।

গাড়ি, ঘোড়া, মানুষ কত কত
শহুরে আদব কায়দা চারিপাশে
তার মাঝে এক নতুন স্কুলের মাথায়
`মহিলা বিদ্যালয় ' লেখা আছে।

চাইলেও কি পড়ার উপায় আছে?
মাথা নেড়ে সমাজ পাথর ছোঁড়ে
বড়ো বড়ো পন্ডিতেরা বলেন
"এক্ষুনি দাও স্কুল বন্ধ করে"।

গ্রামে দেখেছিল পিসি, মাসি, কেউ
অসুখ হলেও পেত না চিকিৎসা
তাই ভাবল যখন বড় হবে
ডাক্তার হয়ে মেটাবে সমস্যা।

মনের বাধা, সকল নিয়ম ভেঙে

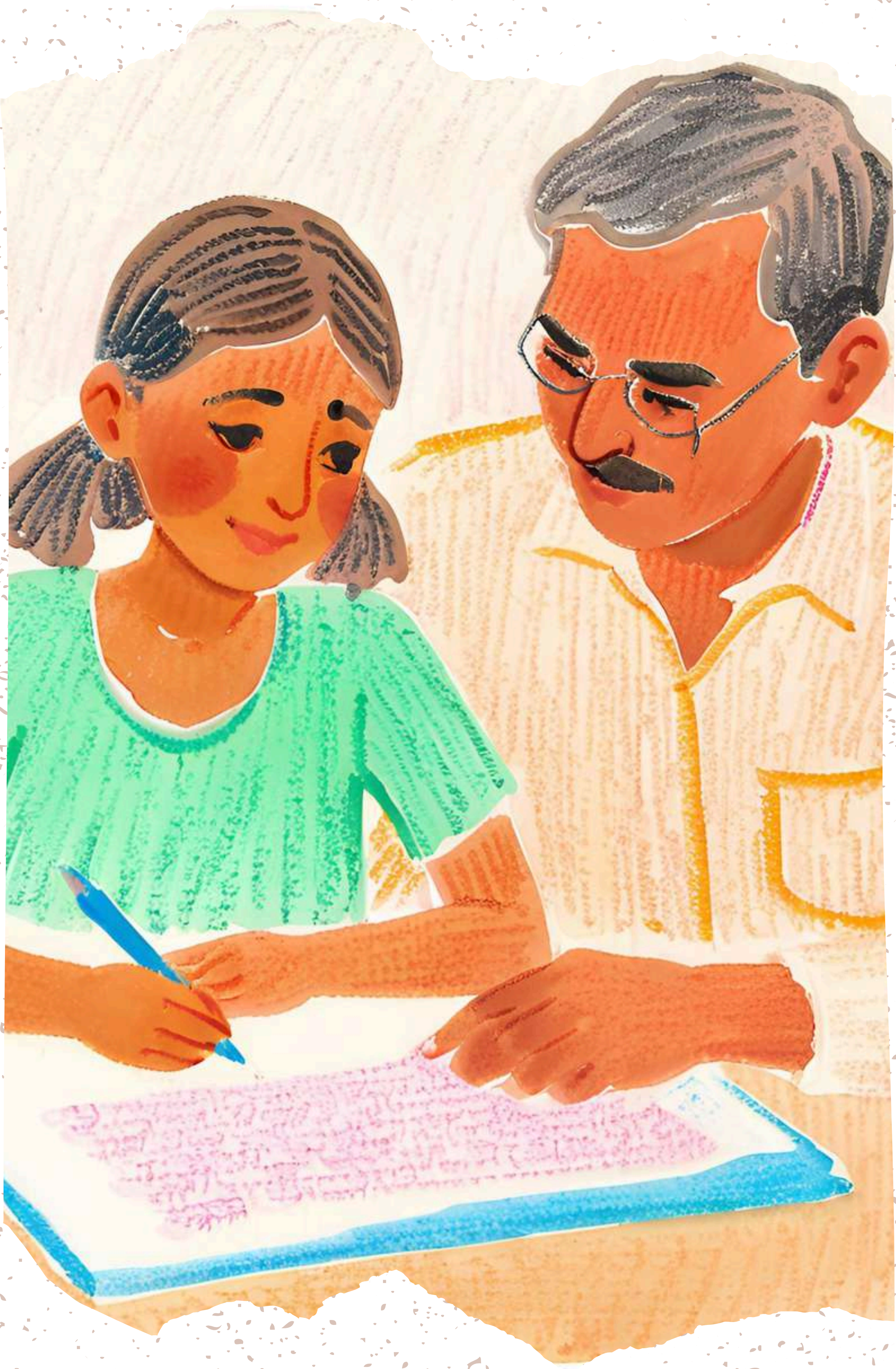

সবার মাঝে প্রথম হল যে
আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন রইল বাকি
সময় এলে ডাক্তারি পড়বে সে।

যতই চেষ্টা করতে থাকে রোজই
শিক্ষকেরা হতে দেন না পাশ
আপন জনেরা সহায় হল তার
কখনোই সে হল না নিরাশ।

উপহাস করেছিল কতজন তারে
হয়ে গেল লজ্জিত তারা সব
স্ত্রী চিকিৎসা প্রচার করল সে
ভারতের বুকে ফোটাল গৌরব।

এখন তার গল্প যখন শোনে
সাহস পায়ে ছোট্ট মেয়ে গুলি
ইতিহাসের পাতায় তারা পড়ে
'প্রথম মহিলা ডাক্তার– কাদম্বিনী গাঙ্গুলি।'

— রূপকথা মন্ডল

VII-B

Edited by রাজন্যা মজুমদার

জাগো মা ; জাগো

জাগো মা

জাগো ;

জাগলে তবে বিচার দেবে ;

ন্যায় বিচার পাবো ।

তোলও মা

 তোলও ;

জং ধরা ত্রিশূল তুলে

মানুষের চোখ খোলো

শোনো মা শোনো

আশা-আকাঙ্ক্ষার

বীজ মনে রেখে

স্বাধীনতার জাল বোনো

মারো মা মারো ;

মহিষাসুর আছে যত

নোংরা লোক কে মারতে তত;

ত্রিশূল দিয়ে বধ করতে!

জানি যে তুমি পারো

শক্তি দাও;

শক্তি!

শক্ত করতে চামড়া

রক্ত করতে গরম

সৃষ্টি তোমারি আমরা !

-সুহাসিনী ঈশা বসু

11-C

সম্পূর্ণ কাজটি সম্পাদনা করেছে: জয়স্মিতা বোস , অস্মিতা বোস